শত্রু এবং বন্ধু

অন্য স্বরকে লেখা সীতাংশু চক্রবর্তীর চিঠিটা পড়লাম। চক্রবর্তীর চিঠির যে জায়গাটার সঙ্গে পড়তে পড়তেই একমত হচ্ছিলাম, সেটা হল খোঁজার প্রশ্ন। যে খোঁজটা এই মার্ক্সবাদ-উত্তরআধুনিকতা কথোপকথন বিষয়ে সবগুলো চিঠিতেই এসেছে। অরিন্দম সেনের, প্রদীপ বসুর, সবারই। কিন্তু, বোধহয়, চক্রবর্তীর চিঠি, খুব সচেতনে না হলেও, কতকগুলো ভুল সিগনাল দিচ্ছে।

অরিন্দম সেনকে সীতাংশু চক্রবর্তীর 'বেচারি' এবং 'অপ্রস্তুত' মনে হয়েছে 'সপ্তরথী'-র আক্রমণের সামনে। এটা একটা ভুল সিগনাল। দুটো জায়গা থেকে, একটা ব্যক্তিগত এবং অন্যটা সামগ্রিক। ব্যক্তিগতটা এই যে অরিন্দম সেনের চিঠি পড়ে আমার কখনোই তাকে বেচারি মনে হয়নি, এবং তার প্রস্তুতির অভাব তো একটুও আসেনি। বরং নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যথেষ্ট রকমে যথেষ্ট প্রস্তুত এবং বলিষ্ঠ ভাবে নিজের কথা বলেছেন। তবে এই ভুল সিগনালটা ততটা বিপজ্জনক নয়, যে কোনো লেখাকে যে কোনো পাঠকেরই নিজের মত করে পড়ার যথেষ্ট ন্যায্য অধিকারই রয়েছে।

দ্বিতীয়, মানে, সামগ্রিক তলের ভুল সিগনালটা সমস্ত অর্থেই মারাত্মক। সপ্তরথী এবং অভিমন্যু এই দুটো মেটাফরই যুদ্ধের। সীতাংশুবাবু, এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। আর, যদি, বিবেচনাহীন, বোধহীন, বুদ্ধিহীন কোনো রকমে এখানে কোনো যুদ্ধ গজিয়ে ওঠেও — সেটা নিতান্তই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। আসল যুদ্ধটা মাথায় রাখুন — পুঁজি আমাদের যে নানা দৃশ্য এবং অদৃশ্য বকলশে বেঁধে রেখেছে তার প্রথম বিশ্বের প্রাসাদের দরজায়, যুদ্ধটা সেই বকলশগুলোর বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধর মেটাফরে ভাইদের আর কমরেডদের ভিতর আলোচনাকে ধরতে চাওয়ার চেষ্টাটাও সেরকমই আর একটা বকলশ। কার বিষয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন সেটা খেয়াল করুন, কাকে ভয় পেতে হবে আর কাকে আক্রমণ করতে হবে সেটা শিখুন, অরিন্দমবাবুর চিঠিতে বোধহয় একবারো যে ভুলটা ছিল না।

একটা ধর্মের মেটাফর ব্যবহার করা যাক। ব্রহ্ম। বা ঈশ্বর। রামকৃষ্ণর আলোচনায় যেভাবে এসেছে, প্রত্যেকদিনের সাংসারিক জাগতিকতার বাইরে একটা বৃহত্তর ব্যাপকতর জায়গাকে ধরতে চাওয়া, যার নাম ব্রহ্ম। আপনি, আমি, অরিন্দম বাবু, প্রদীপ বাবু, আরো আরো অনেক ভাইয়েরা বন্ধুরা আমরা সবাই মিলে, যারা প্রত্যেকেই পুঁজির বকলশগুলো ছিঁড়তে চাইছি, আমরা প্রত্যেকেই সেই আমাদের প্রদত্ত বাস্তবতার থেকে আরো ব্যাপক সেই অর্থগুলোকে সেই সত্যগুলোকে ধরতে চাইছি। আমরা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মের সাধনা করছি। আমরা এই সব কজন প্রত্যেক কজন মিলিয়েও অসম্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু একটা সম্প্রদায়। আমরা প্রত্যেকেই পুঁজির কুকুর, সচেতন বা অসচেতন, পুঁজির বাজার সমাজে বেঁচে থাকার একটাই রকম, কুকুর হয়ে বেঁচে থাকা। এবং অন্য অনেক কুকুরের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে আমরা সেই বকলশটা সম্পর্কে সচেতন এবং নিয়তই নানা প্রকারে গলা এবং বকলশের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছি। যুদ্ধটা তাহলে কার সঙ্গে সীতাংশুবাবু?

আপনি যেখানে সপ্তরথী বনাম অভিমন্যুর অসম যুদ্ধ দেখেছেন, সেখানে যুদ্ধটা আসলে নেই। কিন্তু এটাও পুঁজিরই একটা বকলশ যে আমরা সবকিছুকেই যুদ্ধ দিয়ে বুঝতে চাইছি। পুঁজি তার নিজের রকমে বাস্তবতাকে এসেনশিয়ালাইজ করে, একমাত্রিক করে। সে আমাদের বোঝায় যে আমার সঙ্গে আপনার, আপনার সঙ্গে তার, তার সঙ্গে আমার কোনো মানবিক সম্পর্ক আর অবশিষ্ট নেই এই বাজারভূমিতে। সম্পর্ক শুধু প্রত্যেকের সঙ্গে পণ্যের। এক এক রকমের পণ্য, এক একটা পরিমাণের পণ্য, তার মালিক — এই আমাদের পরিচয়। আর জীবনযাপনের বাস্তবতা বলতে আমাদের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে পুঁজির বাজারের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়ের ভূমি। বিনিময়টাও আপনার আর আমার নয়, পণ্যের সঙ্গে পণ্যের। এটাই তো পণ্য প্রতিমা, কোমোডিটি ফেটিশিজম, তাই তো?

এবার এই পণ্য প্রতিমার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা ভাবুন। বাজারভূমিতে তো আপনি আর আমি নিতান্তই প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতাটা কেনায় আর বেচায়। যখন কিনতে চাইছি তখন আরো কম দামের জন্য দরাদরির প্রতিযোগিতা, আর বেচার সময়ে আরো বেশি দাম পাওয়ার প্রতিযোগিতা। আপনি আর আমি প্রতিযোগী, মানে শত্রু। প্রতিযোগিতা মানে যুদ্ধ।

হবস-এর লেভিয়াথান তো এইরকম সব উপাত্ত নিয়েই। সমাজ নামক এই সমগ্রের বিভিন্ন অংশের মানে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কেবল শত্রুতার। যুদ্ধের। পুঁজির সংস্কৃতির এই জায়গাটায় প্রেম মানেও যুদ্ধ, খেলা মানেও যুদ্ধ, এমনকি সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যে আলোচনাটাও একটা যুদ্ধ। বাজারের যুদ্ধ, বাজারী যুদ্ধ। এই বকলশটা, বা শাসক ক্ষমতার যে কোনো বকলশই, আমরা যে সবসময়েই চাইলেই খুলে ফেলতে পারি তা হয়তো নয়, কিন্তু বকলশটার বিষয়ে সচেতন হতে দোষ কী সীতাংশুবাবু? পুঁজি চায় যে আমরা সবসময়েই সবকিছুকে শুধু যুদ্ধ হিশেবেই দেখি।

এটাই পুঁজির এসেন্স। সে সবকিছুকে এই প্রতিযোগিতা দিয়েই ধরে। আর কোনো কিছু সেখানে অবশিষ্ট থাকেনা। পুঁজির বাজারের প্রতিযোগিতামূলক সাম্য। কিন্তু আমরা তো জানি সাম্য আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস, কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস। পুঁজির এসেন্স ফাটিয়ে একসময়ে কাঁচা খিদে বেরিয়ে আসে, চিবিয়ে খেতে চায় বাস্তবতাকে। এসেন্সের ফাটল বেয়ে বেরিয়ে আসে আরো অনেক সমস্ত কিছু। বেরিয়ে আসে এই পৃথিবীর এখনো অটুটতম বন্ধুত্ব, খিদের কমরেডশিপ, নানা আকারে নানা চেহারায় ফুটে

ওঠে সেই বন্ধুত্ব, গজিয়ে ওঠে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল। শ্রমিকের শ্রম দেওয়ার, শ্রম দিয়ে সমস্ত সমস্ত সম্পদ নির্মাণের পরেও বঞ্চিত হওয়ার বাস্তবতার সহমর্মিতা, সহযোগ, ভালোবাসা। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা — যাকে পুঁজি বোঝে না, আমরা তাই পুঁজির চেয়ে বড়, আমরা তো মনে করি, স্বপ্ন দেখি, পুঁজির এই শাসন একসময় থাকবে না, কিন্তু আমরা থাকব। আমরা পশ্চিমের চেয়ে বড়, পুঁজির চেয়ে বড়, উই আর বিগার দ্যান জিসাস।

পুঁজির বাজার-সাম্যের এসেন্সের বাইরে আমাদের ভাবালেন, আমাদের লড়াইকে নিয়ে এলেন মার্ক্স। গোটা একটা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মানুষের লড়াইয়ের প্রায় একমাত্র আধার হয়ে দাঁড়াল মার্ক্স, মার্ক্সবাদ, মার্ক্সবাদী রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি, সোশালিজম। দেখা যেতে লাগল লড়াইয়ের সেই ইতিহাসের মধ্যেও ছোট ছোট ঘূর্ণী, ছোট ছোট আবিষ্কার যে বোধহয় আরো অন্যরকম কিছু বলার আছে, আরো অন্যরকম করে বলার আছে।

পণ্য প্রতিমার মত করে মার্ক্সকেও যদি একটা প্রতিমা করে না ফেলেন, প্রতিমা মানে চকচকে রোমাঞ্চকর কিন্তু মৃত এবং স্থবির, তা হলে একটা জায়গাকে খেয়াল করুন। মার্ক্স এবং মার্ক্স-এর উত্তরাধিকারের প্রশ্নটাকে। প্রথমেই দেখুন, মার্ক্স আর মার্ক্সবাদ কিন্তু পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও হুবহু এক নয়। ঠিক সেই একইরকম সম্পর্ক মার্ক্সবাদ আর মার্ক্সবাদী রাজনীতির, এবং, সর্বশেষ, মার্ক্সবাদী রাজনীতি আর মানুষের সামগ্রিক লড়াইয়ের ইতিহাসের। আপনি ফুকোর কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন বাংলা অনুবাদে। ব্যক্তি ফুকো যেখানে মার্ক্সকে খিস্তি করছে। ব্যক্তি ফুকোকে আপনি এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ করছেন কেন? আমরা তো কোনো ফুকো ফ্যান ক্লাব করতে চাইছি না। কখনোই কাউকেই খিস্তি-করার কোনো মানে হয় না, প্রায় সবসময়েই খিস্তি-করা নামক ক্রিয়াটা কোনো না কোনো আত্মবিশ্বাসের অভাবকে চিহ্নিত করে। ব্যক্তি ফুকো যদি অমন ক্যবলা এবং বোকাই হয় তাতে আপনারই বা কী, আমারই বা কী। মার্ক্স যেমন, তেমনি ফুকোও এখানে একটা চিন্তা প্রক্রিয়ার নাম। একটা তাত্ত্বিক অবস্থানের নাম। যে ফুকো ওই ক্যাবলা ফুকোর চেয়ে অনেক বড়। ঠিক যেমন মার্ক্সবাদ মার্ক্স-এর চেয়ে বড়। পরিচারিকার গর্ভে মার্ক্স-এর অবৈধ সন্তানকে মার্ক্স-এর পিতৃপরিচয় না-দেওয়া নিয়ে মার্ক্সবাদী রাজনীতিকে ছোট করার বোকা বুর্জোয়া নাটকেরই আপনি এখানে একটা পুনরভিনয় করছেন।

পুঁজির বাজার-সাম্যের আপাত অবগুণ্ঠনের পিছনে পুঁজির গোপন শাসনকে চিহ্নিত করেছিলেন মার্ক্স। সেই শাসনকে আরো গভীর অব্দি, তার শরীরের, জীবনের, অস্তিত্বের গভীরতম অন্তঃস্থল অব্দি চারিয়ে যাওয়ার প্রকৌশলকে ব্যাখ্যা করে দেখাল আর একটা তাত্ত্বিক অবস্থান, তার নাম ফুকো। যে ফুকো নামক তাত্ত্বিক অবস্থান ওই ব্যক্তি ফুকোর চেয়ে অনেক বড়। এবং ফুকো নামক অবস্থান সেখানে মার্ক্স নামক অবস্থানের অত্যন্ত নিকট আত্মীয়। মার্ক্স অর্থনৈতিক শাসনকে দেখেছিলেন। ফুকো খেয়াল করালেন, শাসনটা আরো বড়, আরো গভীর। একজন শ্রমিক যখন শ্রমশক্তি বেচে, যেহেতু শ্রমশক্তি সেই পণ্য যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কর্তিত বিশ্লিষ্ট করা যায় না, শ্রমিক তার দেহসমেত আশরীর আটকে থাকে তার শ্রমপ্রক্রিয়ার খাঁচায় — যে শাসন অর্থনৈতিক শাসনের থেকে অনেক আদিম, খাঁচার জন্তুকে মানুষ যেমন শাসন করে এসেছে সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে। এই শাসনকেই চারিয়ে যেতে দেখলেন ফুকো, সমাজপ্রক্রিয়ার সর্বস্তরে। জেলখানায়, হাসপাতালে, ইস্কুলে, আমাদের সেক্স-সংক্রান্ত আলোচনায়, যে কোনো আলোচনায়। আলোচনার রাজনীতির শাসনকে দেখালেন ফুকো তার 'অর্ডার অফ ডিসকোর্স' প্রবন্ধে। যে শাসনের ব্যাকরণের আলোচনার শুরু হয়েছিল মার্ক্স-এর লেখায়। এবার দেখুন তো সীতাংশুবাবু, মার্ক্স-এর তত্ত্বের সঙ্গে ফুকোর তত্ত্বের আত্মীয়তাটা কি আপনার উদ্ধৃতিতে 'লোকটা' মার্ক্স বিষয়ে ব্যক্তি ফুকোর ছ্যাবলামির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লাগছে না? এইভাবে পড়লে ফুকোর সঙ্গে আমাদের কি একটা কমরেডশিপও গড়ে উঠছে না?

প্রদীপ বসুর সঙ্গে, অনিন্দ্য সেনের সঙ্গে অনেকবার যেটা কথায় আলোচনায় এসেছে — আমার কাছে এই মার্ক্সবাদ উত্তরআধুনিকতা কথোপকথনটা সম্ভব কি সম্ভব নয়, এই প্রশ্নটাই একটু উদ্ভট লাগে। ফিজিক্সের ভাষায়, একটা ননফিজিবল কোয়েশ্চেন বলে মনে হয়। অন্তত আমার কাছে এদুটো ততটা বিচ্ছিন্নই নয় যাতে এদের কথোপকথনটা আলাদা করে শুরু করার চেষ্টা করার আমি আলাদা করে কোনো মানে পাই।

আমি জানিনা, আলশেমিটাই সেটার কারণ কিনা, সৌমিত্র বসু মাঝে বলেছিল, ও মার্ক্স-এর লেখা থেকেই উত্তরআধুনিক কতকগুলো মূল ছক, ওভারডিটারমিনেশন ইত্যাদি, তার ইঙ্গিতগুলো কী ভাবে রয়েছে তা নিয়ে লিখবে, সেটা তো লিখল না এখনো। আমার আর এক বন্ধু, প্রদীপ ব্যানার্জি-ও ইঙ্গিত দিয়েছিল, ক্যাপিটালের তৃতীয় ভলুমে কিছু পোস্টমডার্ন ইঙ্গিত ও পেয়েছে, ক্লাস প্রসঙ্গে। ওই যা আগেই লিখলাম, মার্ক্স আর মার্ক্সবাদ আর মার্ক্সবাদী রাজনীতি এগুলো তো হুবহু এক নয়। এমনকি সৌমিত্র বসু বা প্রদীপ ব্যানার্জি যদি ওগুলো শেষ অব্দি খুঁজে নাও পায়, তাতেও ঘোড়ার ডিম এসে যায়। মার্ক্সবাদের ভিতর শাসনকে প্রত্যক্ষ করার কিছু খামতির কথা তো আগেই বললাম, এরকম আরো অনেকেই আছে। যা নিয়ে প্রচুর লেখা আছে। কারখানার শ্রমের ভিত্তিতে তার তত্ত্বকে গড়লেন মার্ক্স, যে শ্রমের ভিতর তার দাম্পত্য বা পারিবারিক অংশীদারের কথা রইল না, তার মুখ অব্দি খাবার পৌঁছনোর শ্রম, বা তার বাল্যকালে তাকে শ্রমশক্তি বিক্রির যোগ্যতা অব্দি পৌঁছে দেওয়ার পিছনে লালন পালনের শ্রম, এগুলোর কোনো হদিশই রইল না। এরকম আরো বহু কেলো আছে। ওই বাজার সাম্যের পিছনে সংস্কৃতি রাজনীতি আর অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের মার্ক্সবাদী ছক বিষয়ে কেলো ইত্যাদি।

এবং গল্পটা কিন্তু এই কেলোবিবরনেই শেষ হয়ে যায় না। আমাদের অনেকেরই সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তন হয়েছিল মার্ক্সীয় দর্শনের পেটের ভিতর বসে। বা বলা ভালো আমাদের যাকে মার্ক্সীয় দর্শন বলে মনে হত। অল্প অল্প করে মার্ক্স, লেনিন, মাও, লিও শাও চি, কডওয়েল ইত্যাদি পড়ে, বা এদের নিয়ে পার্টি নেতাদের লেখা, এবং প্রাত্যহিক রাজনীতিকে ঘিরে কমরেডদের নিজেদের ভিতর আলোচনায়। তাই আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল কার্য-কারণ সম্পর্ক, যে কোনো একটা ঘটনা বা বিষয়ের পিছনে কারণ সংস্থানকে বোঝা। আমরা এই কেলোর পিছনের কারণগুলোকে বুঝে উঠতে চাইছিলাম। আমি জানিনা, সেদিন আমাদের রাজনীতির কমরেডদের খুব স্পষ্ট ভাবে মনে আছে কিনা, কিন্তু আমার খুব ভালো করে মনে আছে পুরো ব্যাপারটার গোটা বিস্ময়টাই, সেদিন আমাদের নিজেদের আলোচনা থেকে শ্রেণী সংক্রান্ত আমাদের ধারণায় যে জায়গাগুলো বেরিয়ে এসেছিল, পরে হুবহু প্রায় সেই একই জিনিষ খুঁজে পাই রেজনিক উলফের নলেজ অ্যান্ড ক্লাসে। খুব অবাকও হয়েছিলাম প্রথমবার পড়ার পর। ভৌত ধারণা বাদ দিয়ে শ্রেণীকে বোঝার এই জায়গাগুলোই তো আমরা বলতাম। শুধু আমরা সেই পুরোটাকে একটা বৃহত্তর তাত্ত্বিক কাঠামো দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করিনি। অর্থাৎ, যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা এই যে আমাদের অনেকেরই কাছে উত্তরআধুনিকতাটা কোনো আকাশ থেকে পড়া বস্তু নয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই ওর খুব কাছাকাছি জিনিষপত্তর তৈরি হয়ে উঠছিল। নিজেদের রাজনীতি ভাবনার মধ্যে কিছুতেই মিলিয়ে না-উঠতে-পারা গন্ডগোলগুলোকে ক্রমে একটা বোঝার জায়গা আমাদের করে দিচ্ছিল উত্তরআধুনিক তত্ত্ব। মার্ক্সবাদী রাজনীতির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং এখনো অব্দি সবচেয়ে সফল যে মডেল, মানে কমিউনিস্ট পার্টি তার সঙ্গে বৃহত্তর বাস্তবতার সম্পর্কের জায়গাগুলোকেও বোঝার জায়গাও। দূর রাশিয়ার বা রোমানিয়ার বা নিকট কলকাতার রাজনৈতিক নেতাদের, বা, সামগ্রিক অর্থে কমিউনিস্ট পার্টির, যেসব কান্ডকারখানা দেখছিলাম বা জানছিলাম সেগুলোকেও তাদের কার্যকারণ সম্পর্ক সহ বোঝার জায়গা করে দিচ্ছিল।

মানে, কথোপকথনটা চলছিল বা চলছেই। যে বকলশগুলোকে বুঝতে শুরু করেছিলাম মার্ক্সবাদী অবস্থান থেকেই, সেগুলোকে আরো গভীর ভাবে বোঝার দরকার পড়ছে। ক্রমে জরুরি হয়ে পড়ছে ক্রিয়ার রাজনীতির সঙ্গে চিন্তার রাজনীতিকে বোঝা। আপনার আমার আলোচনার অধিকার, মানে শুধু লেখার বা পড়ার নয়, ভাবার অধিকারও বেহাত হয়ে যাওয়ার ক্ষমতার রাজনীতি বিষয়ে বুঝে নিতে গিয়ে প্রয়োজন পড়ছে উত্তরআধুনিকতার। এটারও গোড়াপত্তন গ্রামশির হেজেমনি ধারণার থেকে, যাতে গ্রামশি পৌঁছেছিলেন তার প্রাত্যহিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল নতুন কিছু পরিপ্রেক্ষিত, যেখানে মার্ক্সবাদী রাজনীতির চিরাচরিত অবস্থানটা উল্টে গেছে। মার্ক্সবাদ যেখানে শাসক ক্ষমতা, সেখানে হেজেমনির আকারটা ঠিক কী দাঁড়ায়? যেখানে যেখানে যতটুকু যতবার মার্ক্সবাদ নিজেই বিরোধী না থেকে শাসক হতে পেরেছে, সেখানে আলোচনার অধিকারের সঙ্গে সেই মার্ক্সবাদী শাসনের সম্পর্কটা বোঝার জন্যেও প্রয়োজন পড়ছে উত্তরআধুনিকত চিন্তার মডেল।

আর পৃথিবীতো প্রতিনিয়তই বদলে যাচ্ছে। যে কথা আপনি নিজেও বলেছেন। সেই পরিবর্তমান পৃথিবীতে তত্ত্বেরও নানা অবস্থানের ভিতর দিয়েই আমাদের যেতে হবে বৈকি। দেখলেন তো গোটা একটা বাস্তবতাই কিরকম বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। আমরা যখন 'লাল কিলা পর লাল নিশান মাং রহে হ্যায় হিন্দুস্তান' গাইতাম তখন ক্রেমলিনের কথা ভাবলাম। এখন কোনো ক্রেমলিনই নেই আর। আপনি বলতে পারেন, প্রয়োগে ভুল হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে প্রশ্নটাকে এড়াবেন না, প্রয়োগে ওরকম মারাত্মক ভুল কেন অনবরত হতেই থাকল? আমরা হাঁদা গঙ্গারামেরা হামলে পড়তাম নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারের প্রতিটি ওঠানামার উপর, প্রতিটি কনফারেন্সে, এবার শালা পুঁজির পতন অনিবার্য, অলঙ্ঘনীয় চরমতম পতন, এদিকে তারা তো সোমত্থ হৃষ্টপুষ্টই রইল, হাওয়া হয়ে গেল ক্রেমলিন। কেন বিপ্লবের এবং সাম্যের এতাবৎ তাত্ত্বিক অনিবার্যতার পরও, পুঁজিবাদের পতনের তাত্ত্বিক অনিবার্যতার পরও, পুঁজিবাদ নয়, হাওয়া হয়ে যায় সমাজবাদই? তিয়ানআনমেন যদি পুঁজির প্রচারের ফসলই হয়, সাম্যবাদের নিজের দেশে সাম্যবাদের নিজের প্রচার কোন ছাগলের ঘাষ কাটছিল? আমাদের অর্থনীতির হাল তো আমরা প্রত্যেকেই জানি, তাও চারদিকে কেন এতো সংগ্রামী প্রাণের অভাব? অ্যামওয়েজ নামে সাবানের কোম্পানি প্রত্যেকদিন তাদের যেকটা ফিরিওলা মানে বলির ছাগল যোগাড় করে, তার অর্ধেক লোকও কেন দেখিনা স্ট্রিট কর্নারগুলোয়? কেন? মানুষেরা বলদ বলে? মানুষ বোধহয় বলদ নয়, সীতাংশবাবু। আর যদি তাদের বলদ বলে ডাকিও, সেই বলদীয় বাস্তবতার বলদীয় বিপ্লবের ব্যাকরণ লাগবে, পুরোনো মানুষীয় ব্যাকরণ আর ঠিক কাজে লাগছে না।

আমরা যদি প্রশ্নগুলোকে বোঝার চেষ্টা না করি, বাস্তবতাকে দেখার নিজেদের অবস্থানগুলোকে বারবার যাচাই করে না নিই, তাহলে গন্ডগোলগুলো বারবারই ঘটতে থাকবে। গন্ডগোলগুলোকে বোঝার উপায় হিশেবে কী ভাবে একটা নন-এসেনসিয়াল একটা তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে ভাবনা চিন্তা শুরু করা যেতে পারে সে নিয়ে প্রচুর আলোচনা তো অন্যত্র হয়েছে, এখানে আর আনছি না। একটা জিনিষ আমাদের বোঝার আছে। হেগেলের তত্ত্ব নিয়ে সিএলআর জেমসের নোটের একটা উদাহরণ কাজে লাগিয়ে বলা যায়, যে মুহূর্তে আমরা কালির ফোঁটা ফেলে টেবিলঢাকায় একটা দাগ ফেললাম, অমনি দাগ তো চিহ্নিত হলই, সেই একই ক্রিয়ায় চিহ্নিত হয়ে টেবিলঢাকার দাগ-না-পড়া অংশটাও। অর্থাৎ, একটা সত্তা চিহ্নিত হয় তার অপর বা আদারকে নিয়েই। ক্ষমতা থাকা মানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধও থাকা। সেই প্রতিরোধের ব্যাকরণটা মার্ক্স-এর চেয়ে বড়, ফুকোর চেয়ে বড়, আপনার আমার অন্য স্বরের, রাশিয়ার আমেরিকার চেয়ে বড়। তাই, খিদের

তাড়নাহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি যে আমরা তারা পুঁজির চেয়েও বড়। পুঁজি যখন থাকবে না তখনো শাসন থাকবে তাই প্রতিরোধও থাকবে তাই স্বপ্নও থাকবে।

আমার ওই হেগেলবিদ বন্ধু প্রদীপ ব্যানার্জি তাদের ল্যান্ড রিফর্মের ইউনিয়নের মিটিং-এ অন্যরকম তত্ত্ব উপস্থিত করার চেষ্টায় বলতে গিয়েছিল যে, 'ইউএসএসআর হাওয়া হয়ে যাওয়া মানেই এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড নয়, সমাপ্তি নয়, কারণ পুঁজি যদি পোলারাইজড, এককেন্দ্রিক হয়ে গিয়ে থাকে, শ্রম-ওতো পোলারাইজড, হয়তো এবারেই সম্ভব সত্যিকারের ইন্টারন্যাশনাল'। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক সিপিএমএর লোকাল নেতাদের সেসব পছন্দ হয়নি, তারা ব্যানার্জিকে ইউনিয়ন থেকে বার করে দিয়েছিল, আর একটু মাটিতে ফেলে সামান্য কিছু লাথি মেরেছিল। তাদের নয় সত্যিই অনেক হারানোর আছে, স্টেক আছে অনেক, অনেক চাকরি দেয়ার তবিলদারি, জমি বেচাকেনার কমিশন, কন্ট্রাক্টের কমিশন ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের কোনো স্টেক নেই, আসুন, প্রত্যেকে প্রত্যেককে একটু বোঝার চেষ্টা করি।

অনিন্দ্য সেন আমায় বলল, 'আপনি এত বোকা কেন?' — কেন আমি পড়ার পরেও বুঝতে পারিনি, আপনার লেখায় "কম্পিউটার কি-বোর্ডে হাত চালিয়ে খুঁজে বেড়ায় উপনিবেশের গভীর গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড" লাইনটা আমায় ব্যঙ্গ করেই লেখা। আমি জানি আমি বেশ বোকা, সত্যি আমি এখনো বুঝতে পারিনি যে ওটা নিশ্চিতভাবেই আমায় নিয়েই লেখা। আমি আরো একটা জিনিষ বুঝতে পারিনি, এই কম্পিউটার কি-বোর্ডে হাত চালিয়ে খুঁজে বেড়ানোটা এত ব্যঙ্গনীয়ই বা কেন। দুটো জায়গা হতে পারে। এক, বাস্তব রাজনীতির মধ্যে নেই, তাই ব্যাপারটা বোকা। দুই, কম্পিউটার মানে অনেকগুলো টাকা, তাই ব্যাপারটা বড়লোকি শখ।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা আগে ভাবুন, কম্পিউটার মানে তো কাগজ পেন সময়ের এবং শ্রমের অর্থনীতির জায়গা থেকেও এসে থাকতে পারে। হতেই তো পারে, একটু ভালো ভাবে নিজের কাজটা করার চেষ্টায় কম্পিউটার রাখার চেষ্টায় লোকটার অন্য বহু কষ্ট করতে হচ্ছে, হতেই পারে সেই কষ্টগুলো এমনকি আপনার চেয়েও বেশি? আপনি সেটা জানার চেষ্টার আগেই ভেবে নিলেন কেন ওরকম (যদি এভাবেই ভেবে থাকেন)? এভাবেই ভাবতে চেয়েছেন বলে? কেন চাইলেন? নিজেকে সিপিএমের লোকাল নেতাদের আত্মীয় লাগছে না তো? আর যদি এটা বড়লোকি শখও হয়, তাতে তো তত্ত্বটার সঙ্গতি অসঙ্গতি চিহ্নিত হয় না। দ্বিতীয়, মানে, যদি এটা বাস্তব রাজনীতির বাইরে এরকম ভাবে ভেবে থাকেন, তাহলে প্রথমেই আপনাকে নিজেকে অমার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করতে হয়, কারণ রাজনীতি-অর্থনীতির কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে আপনি এই ক্রিয়াটাকে ভাবলেন বলে। মার্ক্সবাদ এরকম কোনো স্বয়ম্ভু ক্রিয়াকে স্বীকার করেনা। আমরা প্রত্যেকেই রাজনীতির অংশ। শুধু তার এলাকাগুলো আলাদা আলাদা। রাজনীতির তত্ত্বের বিষয়ে লেখালেখিটাও রাজনীতি।

এই ব্যঙ্গটা, বা, আপনার তৃতীয় প্যারাগ্রাফেই যে ব্যঙ্গটা আপনি করেছেন, "তত্ত্বযুদ্ধের এ এক উত্তরআধুনিক নিয়ম; পুরোনো ইতিবাচক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে এই ঘটনার বিচার করতে যাওয়া অনুচিত", এখানে নিজেরই ব্যঙ্গের বিপরীতে তৈরি করা বিচারটা, মানে, উত্তরআধুনিকতা হল নেতিবাচক, আপনার রাজনৈতিক খোঁজের একটা উল্টো সিগনাল দিচ্ছে। শুধু যে আপনার খোঁজাটাকে এটা নষ্ট করছে তাই নয়, আপনার তত্ত্বের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতাকেও হেয় করছে। আমি কোনো উত্তরআধুনিকতার ঠিকাদার না, তার বিষয়ে আপনি কোনো ব্যঙ্গ করলে, এমনকি তার কোনো কোনো ব্যঙ্গ আমাকে নিয়ে এরকমটা অনিন্দ্য মনে করলেও, আমার সত্যিই তাতে কিছু এসে যায় না, আমি বোধহয় তার পক্ষে সত্যিই একটু বেশি বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু এতে অন্য একটা কষ্ট হয়, আপনারা যারা খুঁজছেন তাদের খোঁজার সিরিয়াসনেসটা চলে যায়। বোধহয়।

আপনার ব্যঙ্গ থেকে মনে হচ্ছে, আপনি উত্তরআধুনিকতাকে, অন্য অনেক উত্তরআধুনিকের মত, একটু বেশি নাটকীয় করে দেখছেন। আসলে বোধহয় পার্থক্যের অতটা নাটকীয়তা সেখানে নেই। অঙ্কের থেকে একটা উদাহরণ আনি। ক্যালকুলাস। নিউটন লিবনিতজ এরা মিলে একটা নতুন ধরনের অঙ্কবিদ্যা আবিষ্কার করলেন। ক্যালকুলাস। তাতে একটা বৃত্তকে বোঝা গেল একটা বহুভুজ দিয়ে। যখন বহুভুজের বাহুর সংখ্যাটাকে আমরা ভীষণ ভীষণ বাড়িয়ে দিচ্ছি, অনন্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, তখন বহুভুজের এক একটা বাহু কিন্তু সেই একই হারে ভীষণ ভীষণ ছোটো হয়ে পড়ছে, প্রায় শূন্য হয়ে যাচ্ছে। বাহুর সংখ্যাটা প্রায় অনন্ত, কিন্তু অনন্ত নয়, আবার একটা বাহুর দৈর্ঘ প্রায় শূন্য, কিন্তু শূন্য নয়। এই প্রায়-অনন্ত সংখ্যক বাহু আর প্রায়-শূন্য বাহু-দৈর্ঘ দিয়ে ক্যালকুলাস এমন একটা কাজ করতে পারল যা ক্যালকুলাসের আগে অব্দি আর কোনো অঙ্কবিদ্যা পারত না, মানে, একটা বক্ররেখা সম্পন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রকে পরিমাপ করা। এবার সেটা খুব সহজেই করা গেল, ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ঠিক এটাই করে, একটা বক্ররেখাকে অজস্র প্রায়-শূন্য টুকরোয় ভেঙে ফেলে বক্ররেখাকে, তারা এবার সরলরেখা, তাই তাদের ক্ষেত্রফল বার করা যায় সহজেই। এবার ভাবুন তো, ঠিক এইভাবেই কি মানুষ সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে প্রাকৃতিক ক্ষেত্রগুলোকে মেপে আসেনি? ছোট আরো ছোট আরো আরো ছোট সরলরেখ টুকরোয় ভেঙে ভেঙে নিয়ে? সেই পুরো প্রক্রিয়াটাকে একটা তাত্ত্বিক আকার এবং কাঠামো দিলেন নিউটন এবং লিবনিতজ।

বোধহয় এলিয়টই বলেছিলেন, সম্পূর্ণ নতুন কিছু সম্পূর্ণ জঞ্জাল হতে বাধ্য। মার্ক্স তার সময়ের মধ্যে বেঁচে থাকা অজস্র বোধকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটা অবয়ব দিয়েছিলেন, মানুষের প্রতিরোধের রাজনীতির বিষয়ে অত্যন্ত বিপুল একটা সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক সেইরকম, উত্তরআধুনিকতা বলতে আমাদের সামনে যা আসছে তা ভয়ানকভাবেই অনেকদূর অব্দি আমাদের চোখের সামনে আছে। আমরা

সেগুলোকে নিজেরাও প্রয়োগ করে চলেছি। শুধু তাত্ত্বিক কাঠামোটা সম্পর্কে সচেতন না হয়েই। যেমন ভারতীয় অঙ্কবিদ যজ্ঞের ভূমি মাপত, বা মিশরীয় অঙ্কবিদ জমি, ক্যালকুলাসকেই একভাবে কাজে লাগাত, ক্যালকুলাস না জেনে।

আপনার ব্র্যাঞ্চে বসে কোনো মিটিং-এ বসে আপনি কখনো বলেন নি, বা ভাবেন নি, 'ঠিক আছে কমরেড, এটাকে আর খুব বেশিদূর ঠেলে নিয়ে যাবেন না, এই পর্যন্ত থাক, পরে যদি অবস্থা বদলায় তখন ভেবে দেখা যাবে, কী করা যায়'? ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনি এখানে পোস্টমডার্ন ক্লোজার ধারণাকে ব্যবহার করছেন, হয়তো স্ট্র্যাটেজিক এসেন্সকেও।

বা, আরো চমৎকার উদাহরণ জয়েন্ট ফ্রন্ট। সেটাতো স্পষ্ট ভাবে একটা নন-এসেনশিয়াল চিন্তাপদ্ধতিকে হাজির করে। রাম আর শ্যাম পুরোটা একভাবে ভাবে না, তাদের একটা জায়গায় ইশ্যুভিত্তিক ঐক্য হচ্ছে, সেটার ভিত্তিতে তারা গড়ে তুলছে একটা জয়েন্ট ফ্রন্ট। মার্ক্সবাদকে একটা নন-এসেনশিয়াল রকমে ব্যবহারের এ একটা চমৎকার উদাহরণ।

এই উপরের দুটো উদাহরণে আপনার জার্গনের সমস্যা হতে পারে, সে সমস্যার আপনি উল্লেখও করেছেন। কিন্তু যে কোনো সিরিয়াস আলোচনাতেই, কিছু জার্গন অবশ্যম্ভাবী। কারণ সবগুলো পুরোপুরি ব্যাখ্যা কিছুতেই করে ওঠা যায় না একটা লেখায়, একটা লেখা কতটা বড় হতে পারে তার একটা সীমা তো থাকেই। অঙ্কে বা বিজ্ঞানে অ্যাকশিওম বা স্বতঃসিদ্ধ, বা মানববিজ্ঞানে পয়েন্ট-অফ-ডিপার্চার বা শুরুর বিন্দু। কিছু আলোচনাকে তো ছেড়ে দিতেই হয়। যেমন ধরুন আগের দুটো প্যারাগ্রাফে ব্যবহৃত প্রতিটি জার্গনেরই সামগ্রিক আলোচনা আছে আপনি যে পত্রিকাগুলো উল্লেখ করেছেন তার ওই লেখাগুলোতেই। এবার আপনি জানেন, আমি জানি, অন্য কেউ যদি এই লেখাটা পুরোপুরি খুব ভালো করে বুঝতে চায় তাকে আরো কিছু লেখা পড়তেই হবে। সেই পরিশ্রম দেওয়ার সিরিয়াসনেস তাকে অর্জন করতেই হবে।

উত্তরআধুনিকরা নিজেরা বহুসময়েই তাদের চিন্তার মডেলগুলোকে বিলোল মুগ্ধতায় এবং বিস্ময়ে ভরে দিতে চায়, তার কারণ আর কিছুই নয়, নিজেদের মালের বিশেষত্ব হাজির করা। অ্যাডভারটাইজমেন্ট। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন ডিকন্সট্রাকশন। পশ্চিমের সবচেয়ে মেধাবি একজন দার্শনিক বুদ্ধিজীবী দেরিদার গ্রামাটলজি পশ্চিমের আর একজন মেধাবি অনুবাদক বুদ্ধিজীবী স্পিভাকের অনুবাদ মারফত আমাদের কাছে পৌঁছল চিন্তার এই মডেল। কিন্তু ঠিক ওই ক্যালকুলাসের উদাহরণের মতই, একভাবে যে কোনো ভালো সমালোচক বা দার্শনিক কি চিরকালই ডিকন্সট্রাকশন করে আসছিলেন না? বেজায় পুরোনো দিনের, চৈতন্যের সমসাময়িক একজন প্রতিভাবান বাঙালি লেখক ছিলেন মধুসূদন সরস্বতী। যদিও সংস্কৃতয়, তিনি একটা বই লিখেছিলেন, গূঢ়ার্থ দীপিকা নামে। গীতার একটা ভাষ্য। গীতার একদম পয়লা শ্লোকেই 'মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়' বাক্যাংশ আলোচনা করতে গিয়ে মধুসূদন লিখেছেন, মামকাঃ (মানে আমার আত্মীয়রা), তার সঙ্গে পাণ্ডবাশ্চৈব (এবং পাণ্ডবেরাও) লাগালেন কেন ধৃতরাষ্ট্র? পাণ্ডবেরাও তো তার নিজেরই আত্মীয়। এর কারণ এই যে তার একটু বাদেই তাদের বধের আদেশ দিতে হবে তাকে। নিজের সঙ্গে নিজের ভাইয়ের ছেলেদের আবেগগত দূরত্বটাকে তাই বাড়িয়ে তুলতে চাইছেন ধৃতরাষ্ট্র।

ঠিক এই কায়দায় এরপর গোটা গীতাটাকে ডিকন্সট্রাক্ট করে গেছেন মধুসূদন। অর্থাৎ, আপাতত, আমাদের সামনে উত্তরআধুনিক তত্ত্বকাঠামোগুলো যতটা নাটকীয় করে দেখানো হচ্ছে সেই নাটকীয় তারা আদৌ নয়। আমাদের মধ্যেই এই চিন্তাগুলো আছে। আমাদের নিজেদের বেদনা নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেদের মত করে ভাবতে গিয়েই সেগুলো গজিয়ে উঠছে। এক এক জন বড় মাপের তাত্ত্বিক তাকে একটা কাঠামো দিচ্ছেন। আলাদা একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি হচ্ছে গোটা ব্যাপারটার। পাড়ায় যে ছেলেগুলো বসে আড্ডা মারত একসাথে তারা কবে একত্রে ক্লাব, এবং আরো পরে এনজিও হয়ে গেল — সেটা আমরা তখন খেয়াল করছি।

শুধু তাদের মুখোমুখি হতে গিয়ে কতকগুলো তাত্ত্বিক আড়ষ্টতা আমাদের কাজ করে চলেছে। একটু অন্যরকম কোনো কথা শুনলেই আমরা ভাবতে শুরু করছি, এই আর একটা শত্রু, এই আর একটা আক্রমণ। যেমন প্রথমেই বলেছিলাম, এটাও আর একটা বকলশ। আসলে আমাদের শত্রু আর যুদ্ধের অভাব নেই, সীতাংশুবাবু। তাই, ভ্রাতৃঘাতী বন্ধুঘাতী অনর্থক যুদ্ধ আর বাড়াবেন না। আমরা নানা জনে নানা কথা বলছি। আমরা সবাই যে খুব বুদ্ধিমান কথা বলব তার কোনো মানে নেই। অনিন্দ্য যেমন আমার বিষয়ে জানিয়েছে, তেমনি আমাদের অনেকের কথা হয়তো খুব বোকাও হবে, কিন্তু সেটা শত্রুর কথা নয়। এটা মনে রেখে পড়ুন। সবাইকে শত্রু ভাবাটা একটা প্যারানইয়া, এখান থেকেই ফ্যাসিজম জন্মায়, কমিউনিস্ট ফ্যাসিজমও। আমাদের অনেকেই বোকা হতে পারে, অপ্রস্তুত হতে পারে, কিন্তু মোট খোঁজাটা বুদ্ধিমান খোঁজাটা তৈরি হবে তাদের নিয়েই।

আপনি একটা ওয়ান-লাইনার উদ্ধৃত করেছেন, "জ্ঞানী আহাম্মকগুলো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকেও কিং লিয়ারের সাহিত্য হিশেবে পড়ে"। বেশ স্মার্ট ওয়ান-লাইনার। শুনতে বেড়ে। তারপর আর একটু ভাবুন। কী কী মূল্যপ্রদান এতে আছে সেটা ভাবা যাক। এক, জ্ঞানী হয়েও আহাম্মক, কী ভয়ানক আহাম্মক, এবং বিপজ্জনকও বটে, চট করে তো আহাম্মক বলে ভাবা যায়না। দুই, কিং লিয়ারের সাহিত্য হিশেবে পড়া — মানে অবশ্যই বলতে চাওয়া হল, কম জটিলতায় পড়া, জ্যান্ত রাজনীতির লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়া, অনেক কম মনোযোগে পড়া, সাহিত্য যেমন মনোযোগে পড়লেই চলে যায়, মানে রাজনীতির চেয়ে কম। প্রথমত, কিং লিয়ার বা তার লেখকের এতে কিছু এসে গেল কিনা জানিনা, কিন্তু আপনার বোধহয় গেল, আপনি এতগুলো জায়গা সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে এবং বুঝে বসে আছেন এটা আপনার রাজনৈতিক খোঁজের সিরিয়াসনেসকে চূড়ান্ত আঘাত করল।

সাহিত্য পড়ার মধ্যেই যে রাজনীতি পাঠের সিরিয়াসনেস নেই এটা আপনি প্রথমেই ধরে নিলেন। আপনি কী করেন না করেন সেটা এখানে বিবেচ্য নয়, যে লোকগুলো সত্যিই সাহিত্যপাঠ করে নিজের ছেলেমেয়ের প্রতি ভালোবাসার সিরিয়াসনেস নিয়ে তাদের আপনি প্রথমেই ছোট করলেন। আর রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্য তথা গদ্য তথা ভাষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নিয়ে, যা বুঝতে মার্ক্সবাদী কাঠামোই যথেষ্ট এগিয়ে দেয় আমাদের, ডায়ালেক্টিক্স দিয়েই যে জটিলতাকে যথেষ্ট আনা যায়, তার প্রতি আপনার রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে নষ্ট করলেন। বাখতিন থেকে শুরু করে অনেকগুলো লোক তাদের সারাটা জীবন দিয়ে গেছে এই পাঠের সিরিয়াসনেসে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিরিয়াসনেস নিয়েই, দেখিয়েছেন তারা, কী ভাবে বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতির একটা বড় জায়গা অসম্পূর্ণ রয়ে যেত দস্তয়েভস্কির গদ্য ব্যতিরেকে। আমরা ভাবি যে ভাষা মানে শব্দ আর বাক্য দিয়ে — সেই ভাষাকেই বদলাতে থাকে সাহিত্য, তাই আমাদের চিন্তার মাধ্যমটাই বদলে যেতে থাকে সাহিত্য দিয়ে — এটুকু বুঝতে উত্তরআধুনিকতা লাগেনা, মার্ক্সবাদ বারংবার এটা চিহ্নিত করেছে।

ওয়ানলাইনারের স্মার্টনেসও একটা বাজার প্রকৌশল। হলিউড থেকে আমাদের ডেভিড ধাওয়ানের সিনেমা অব্দি, আরো যদি তার স্ক্রিপ্ট করা হয় কাদের খানের। কিন্তু ও দিয়ে কী হয়, সীতাংশুবাবু? অন্যকে আহাম্মক বলার মধ্যে একটা নিজেকে তৃপ্ত করার আনন্দ থাকে হয়ত, কিন্তু যে রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা আপনি এনেছেন তার আকারটা কী দাঁড়ায়? কে জানে অন্য কেউ কী জানে? কে বোঝে অন্য কেউ কী বোঝে? নিজের বোকামিগুলো মাঝে মাঝে বুঝতে পারি, বেশিরভাগই পারিনা, অনিন্দ্যর মত ভালো বন্ধু হলে কেউ কেউ কখনো ধরিয়ে দেয়, অন্যরা তাও দেয়না। আর অন্যের বোকামো — তার কথা ছেড়েই দিন। এমনকি যদি আপনি অন্যের বোকামি বুঝতে পারেনও, ধরা যাক আপনি ঠিকই পারলেন, তাতেই বা কী হল? ওই যে আগেই বললাম, লোকগুলো যদি বলদও হয়, আপনাকে তো সেই বলদীয় বাস্তবতাতেই বোঝাতে হবে, আরো যত্ন নিয়ে, আরো ধরে ধরে। আচ্ছা, সত্যিই আপনি নিজের রাজনীতির ব্যাপারে ততটা সিরিয়াস সীতাংশুবাবু, যতটা আপনার চিঠিতে হাজির?

যতটা আপনি হাজির করেছেন আপনার রাজনীতির শুদ্ধতাকে? আপনি সিপিএম থেকে এসএফআই থেকে কনভার্ট নন। আপনি পিওর, আদি ও অকৃত্রিম। এতে আপনি আনন্দ পেতেই পারেন. কিন্তু কনভার্টদের হেয় করা কেন? আপনি জিত হো, উনকি হার হাঁ? আপনাকে ভালো দেখতে গেলেই কেন অন্যকে খারাপ দেখতে হচ্ছে? শুদ্ধ ভালো, কনভার্ট খারাপ, রাজনীতি ভালো, সাহিত্য তার চেয়ে কম ভালো, মানে খারাপ? একটাকে ভালো করতে গেলেই অন্যটাকে খারাপ হতে হবে? একসঙ্গে একাধিক জিনিষ একাধিক রকমে ভালো হতে পারে না? আপনি যদি এই কথা বলতেন, "সাহিত্যসেবীরা দয়া করে রক্ত ঘাম মৃত্যুর জ্যান্ত রাজনীতিটা মাথায় রেখে ম্যানিফেস্টোটা পড়ুন", তাতে অন্য কাউকে ছোট করতেও হত না, বরং আপনার বন্ধুস্থানীয় একজনকে (সে আপনার বন্ধু বটেই, নইলে সে সাবান বেচতে যেত, ম্যানিফেস্টো নিয়ে মাথা ঘামাতে যেত না, আর যদি সে বিরুদ্ধতার জায়গা থেকেই পড়ে, তাহলে তো সে সবচেয়ে শুভাকাঙ্খী, কারণ আপনার ত্রুটি সে ধরিয়ে দেবে) তার ত্রুটিটা ধরিয়ে দেওয়া হত। উত্তরআধুনিকতার বহুবচনতা বা প্লুরালিজম বোধহয় এটুকুই বলে। একজনকেই, একজনকেই মাত্র ঠিক হতে হবে — এই শর্তের বাইরে ভাবতে পারা। আর তাতে ঐ একেশ্বর একটি মাত্র দৃষ্টিকোণের এসেনশিয়ালিজম থেকে ফ্যাসিবাদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যেত। আপনি যাকে উত্তরআধুনিকতা বলছেন, তা বোধহয় মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে এই জায়গাটাই আনতে চাইছে। আর, তাতে, বৃহত্তর প্রতিরোধের রাজনীতির ভালো যদি কিছু নাই হয়, মন্দ তো কিছু হওয়ার নেই। এর জন্যে পণ্ডিত আহাম্মকদের এই সামান্য মাটিতে ফেলে মৃদু লাথি মারার লোকাল রাজনীতিটা কেন?

মার্ক্স লোকটা তো পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবি সবচেয়ে সিরিয়াস সবচেয়ে জরুরি মানুষগুলোর একজন। তার থেকে একটু শিখুন না? ভেরা জাসুলিচ মার্ক্স-এর চেয়ে বয়সে প্রজ্ঞায় মেধায় প্রভাবে কত ন্যূন, তাও সেই ভেরা জাসুলিচকে লেখা মার্ক্স-এর চিঠিটা পড়ে কোথাও আপনি উষ্মা বা ব্যঙ্গ বা শ্লেষ বা গালাগাল পান কি? আর এই কথাটা তো আগেই বলেছি, বন্ধু আর শত্রু চিনতে আপনার ভুল হচ্ছে। ভাবুন তো যে লোকগুলো এই বাংলা লিটল ম্যাগাজিনে পরিশ্রম করে এই লেখাগুলো লিখে যাচ্ছে, কী দায় তাদের? সেই সময়টা তো তারা ক্ষমতার করিডোরে ঘোরাঘুরি করে তেলবাজি করে কাটাতেই পারত — দুটো পয়সা বা নাম তাতে তাদের বেশি হতেই পারত। আপনি কনভার্টদেরই ছোট করছেন, তাহলে আমার মত সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতির বাইরের কারুর রাজনীতি নিয়ে লেখার ঔদ্ধত্যকে আপনি কী বলবেন? কনভার্টদের বা আমাদের মত আউটসাইডারদের তত্ত্ব দিয়ে তাদের তত্ত্বের বিরোধিতা করুন, প্লিজ গাল দেবেন না। আরো আপনি নিজেই নিজের রাজনীতির নাম করেছেন, তাই সেটাও আপনার মাথায় রাখা উচিত। মনে হতেই পারে যে ওই রাজনৈতিক পরিচয়টা মানেই এইরকম আড়ষ্টতা আর ব্যক্তিগালাগালের ফ্যাসিবাদ। শত্রুতা খোঁজার এই বাজারী রাজনীতির বাইরে এসে দাঁড়ান। আপনি আমাদের অনেককেই সেই সম্মান না দিলেও, আমি আপনাকে কমরেড বলেই মনে করি। যদি এটা আমায় উত্তরআধুনিকতা শিখিয়ে থাকে আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই। উত্তরআধুনিকতা, মার্ক্সবাদ, আপনি, অনিন্দ্য, অরিন্দমবাবু, প্রদীপ বসু, সৌমিত্র বসু, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল, পিডব্লুজি, আপনারা সবাই আমার মাস্টারমশাই — তবে কতটা শিখে উঠতে পারব নিজের সেই ক্যালি নিয়ে সন্দেহ আছে আমার।

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

(ও, এটা কিন্তু আমার বেনাম নয়, অনেক বছর ধরে লিখতে লিখতে লেখার জায়গায় এটাই আমার স্বনাম হয়ে গেছে।)